Scotopia: বিলুপ্তির পথে নারীকন্ঠের লোকসুর
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

বিলুপ্তির পথে নারীকণ্ঠের লোকসুর: দেলের গান

সঞ্চিতা দত্ত
পারফর্মিং আর্টস ডিপার্টমেন্ট(মিউজিক)
সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি

বাংলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার অপার। এর মধ্যে গ্রামীণ জীবনের ভক্তি, প্রেম, হাসি, দুঃখ, আনন্দ, সামাজিক আচার এবং ধর্মীয় আচার সবই একসঙ্গে মিশে গেছে। প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব গান ও নৃত্যধারা আছে, যা তাদের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়। এই লোকগানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হল দেলের গান। এটি মূলত শিবাসন পূজা কেন্দ্রিক এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রামীণ নারীরা পরিবেশন করে আসছেন। দেলের গান কেবল ভক্তিমূলক নয়। এতে রয়েছে প্রেম, হাস্যরস, সামাজিক ব্যঙ্গ, এবং গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এর পরিবেশকরা প্রধানত পুরুষরা দেল-বালা এবং মহিলারা দেল-নাচুনি নামে পরিচিত। পূজার সময় তারা একদিকে হন শিব ও পার্বতীর আখ্যান বর্ণনাকারী, অন্যদিকে হন গ্রামের বিনোদনের মাধ্যম। কিন্তু আধুনিক বিনোদনের প্রসার, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও প্রজন্মান্তরের অনীহার কারণে দেলের গান আজ বিলুপ্তির পথে।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলার এক সুপ্রাচীন লোকসংস্কৃতি হলো 'শিবাসন' বা 'দেলের গান'। এই লোকশিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো নারীকণ্ঠের সুর ও নৃত্য, যা এই ঐতিহ্যকে করে তোলে আরও জীবন্ত ও বর্ণিল। মূলত চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত এই পূজা ও এর সাথে জড়িত গানগুলিতে শিব-পার্বতীর বিবাহ, তাদের গার্হস্থ্য জীবনের নানা দিক, এবং সমাজের হাস্যরসাত্মক চিত্র ফুটে ওঠে। একসময় এই গানগুলিতে নারী ও পুরুষ উভয় শিল্পীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, যেখানে 'দেলের নাচুনি' হিসেবে নারীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও গানে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন।

দেলের গানে নারীরা শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, বরং এই লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। 'পারুল বালা' বা 'দেবলা বালা দাস'-এর মতো শিল্পীরা, যারা দেলের নাচুনি হিসেবে পরিচিত, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে একসময় তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান ও নৃত্য পরিবেশন করতেন। এই শিল্পকলা তাদের জীবিকার একটি অংশ ছিল এবং এটি তাদের পারিবারিক জীবনেও আনন্দের উৎস ছিল। তাদের কণ্ঠের সুর এবং নৃত্যের ছন্দে শিবাসনের পূজা সম্পূর্ণতা পেত এবং দর্শকদের মুগ্ধ করত। এই নারীরাই লোকসংস্কৃতির ধারাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত করতে সাহায্য করেছেন।

শিবাসন পূজার কোনও লিখিত প্রাচীন দলিল পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রামসমাজে মুখে মুখে প্রচলিত আখ্যান ও মিথ রয়েছে, যা দেলের গানের মূলভিত্তি।

অভিজ্ঞ দেল-বালা অমর রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন—
“যখন কোথাও জল ছিল না, লবণ ছিল না, জঙ্গল ছিল না, তখন সব ছিল ধোঁয়া। তখন সৃষ্টিকর্তা বিল ফেলে মাটি তৈরি করলেন। সেই মাটি থেকে জন্ম নিল তিন পুরুষ রত্ন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা, আর শিব সংহারকর্তা। পরে শক্তি এলেন শিবের কাছে ভক্তি জানাতে, কিন্তু শিব ও অন্য দেবতা ভয়ে

Scotopia: বিলুপ্তির পথে নারীকন্ঠের লোকসুর
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

পালালেন। শক্তি নানা জন্মে দগ্ধ হয়ে আবার জন্ম নিলেন, শেষে শিবের সঙ্গে মিলিত হলেন। তখন তাঁদের আসনের নাম হল 'শিবাসন'।"

এই আখ্যান কেবল ধর্মীয় মিথ নয়; এটি সৃষ্টিতত্ব, নারীর পুনর্জন্ম ও প্রেমের প্রতীক। শিবাসন পূজার মাধ্যমে এই আখ্যান দেলের গানের সুরে ও নাট্যমঞ্চে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

চৈত্র মাসে শিবাসন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার প্রস্তুতি নিতে হয় অনেক আগে থেকে। প্রতিমা বানানো, ঘট প্রস্তুত করা, নদী থেকে জল আনা—সবই গ্রামীণ মানুষের যৌথ উদ্যোগ। বিশেষত নারীরা এই প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পূজার দিন দেল-বালা মাথায় প্রতিমা বসান। সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় মন্ত্রপাঠ ও গান। দেল-বালার শরীরকে তখন দেবতার আসন হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আচার নারীকে পূজার কেন্দ্রীয় চরিত্রে পরিণত করে। নারী শরীরের ভেতর দিয়েই তখন দেবতার শক্তি প্রকাশিত হয়।

ঘট স্থাপন এই পূজার একটি প্রধান অংশ। নদী থেকে গোপনে জল আনা হয়—এসময় কাউকে দেখা যাবে না। এই জল আনতে যাওয়ার পথে দেল-বালাকে কেউ দেখতে পেলে পূজা অশুদ্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে নারীর এক বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদা—তাঁর শরীর ও কার্যকলাপকে দেবতার সঙ্গে সমতুল্য ভাবা হয়েছে। সেই জল আমপাতা, নারকেল, ফুল দিয়ে সাজানো ঘট-এ রাখা হয়। শিব পূজার আগে গণপতিকে আহ্বান করা হয়—'ওঁ গজাননং ভূতগণাদিসেবিতং /কাপিত্থজম্বূফলচারুভক্ষণম্/গণপতয়ে নমঃ'। এরপর শিব নমস্কার মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান করা হয়— 'ওঁ ধ্যানিতং মহেশং চন্দ্রকলাবিনিন্দ্রং /গঙ্গাধরং ত্রিনয়নং নাগভূষণাং /শিবায় নমঃ'। অর্থাৎ শিব-পার্বতীর আখ্যানভিত্তিক গান গেয়ে ও নৃত্য পরিবেশন করে পূজার মূল পর্ব সম্পন্ন হয়।

এরপর শুরু হয় গান ও নৃত্য। দেলের গান মূলত শিব-পার্বতীর আখ্যানের উপর ভিত্তি করে গাওয়া হয়। কখনো তাঁদের বিবাহ, কখনো দাম্পত্য জীবনের হাসি-রাগ-অভিমান, কখনো গ্রামীণ জীবনের ব্যঙ্গ—এই মিলেই তৈরি হয় এক অনন্য নাট্যরূপ। ফলে দেলের গান কেবল ভক্তিমূলক গান নয়; এটি নাটক, কৌতুক, সামাজিক রসিকতা এবং নারীর অনুভবের এক মিলিত শিল্পরূপ। গানের মধ্যে গল্প বলা, সংলাপ বিনিময়, নাচ এবং অঙ্গভঙ্গির মিশ্রণ থাকে। বিষয়বস্তু প্রধানত শিব ও পার্বতীর সম্পর্ককে ঘিরে।

একটি জনপ্রিয় আগমনী গান—
"আমার শিব ঠাকুরের আগমন
দেখতে যত ভিড় জন,
আসন লইয়া ফের বাড়ি বাড়ি।"
এখানে আগমন দৃশ্যের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের ভক্তি ও উৎসবের আমেজ স্পষ্ট।

একটি বিবাহপর্বের গান—

"শাঁখারি শিব আসিল গাঁয়ে,
শাঁখা পরাইল পার্বতীর হাতে,

Scotopia: বিলুপ্তির পথে নারীকন্ঠের লোকসুর
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

হাসে গ্রামের সব বউঝি মিলে,
বলে—এবার হল জোড়ের দেখা।''

এখানে শিবের শাঁখারি বেশ, পার্বতীর শাঁখা পরা এবং গ্রামের নারীদের কৌতুকের মিশেল দেখা যায়।

দেলের গান পরিবেশনের মূল দায়িত্ব থাকে গ্রামীণ নারীদের ওপর—যাদের বলা হয় দেল-নাচুনি বা দেল-বালা। এঁরা সাধারণত কৃষক পরিবার থেকে আসেন এবং বছরের বেশিরভাগ সময় গৃহস্থালি ও কৃষিশ্রমে যুক্ত থাকেন। চৈত্র মাসে তারা দেলের গানের জন্য প্রস্তুত হন। দেলের গান একসময় শুধু ধর্মীয় আচার নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিরও অংশ ছিল। পূজার সময় গ্রামবাসীরা দেল-বালাদের চাল, ডাল, সবজি, পোশাক এবং অর্থ দান করতেন। অনেক সময় পূজার শেষে শিল্পীরা নগদ অর্থও পেতেন। এটি তাদের বছরের অন্যতম অতিরিক্ত আয়ের উৎস ছিল।

আগে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান গাওয়ার মাধ্যমে দেল-বালারা কেবল অর্থই উপার্জন করতেন না, বরং সামাজিক মর্যাদাও পেতেন। তারা ছিলেন গ্রামের বিনোদন ও ভক্তি সংস্কৃতির বাহক। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি বদলেছে- পূজা কমে গেছে, মানুষ নগদ দান কম দেয়, স্থানীয়ভাবে কাজের অভাব থাকায় শিল্পীরা বিকল্প জীবিকা বেছে নিচ্ছেন, ফলে দেলের গান এখন আর অর্থনৈতিকভাবে টেকসই নয়।

দেলের গান কখনোই ব্যাপক প্রচার পায়নি। কারণ এটি মূলত এক বিশেষ পূজা—শিবাসন পূজা—কেন্দ্রিক এবং গাইতেন প্রধানত গ্রামীণ নারীরাই। এই নারীকন্ঠের গান ছিল ভক্তি, সামাজিক আচার, নাট্যরস ও নারীর আত্মপ্রকাশের মিশ্রণ। আজ সেই গান প্রায় বিলুপ্তির পথে। আধুনিকতার আগ্রাসন, সামাজিক পরিবর্তন, পূজার সংখ্যা কমে যাওয়া এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে দেলের গান আর আগের মতো টিকে নেই। ফলে বাংলার নারীকন্ঠে বেঁচে থাকা এক অনন্য লোকঐতিহ্য আমাদের চোখের সামনে হারিয়ে যাচ্ছে।

দেলের গানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এটি নারীকন্ঠে পরিবেশিত। প্রথমে পুরুষ কেন্দ্রিক থাকলেও পরবর্তীতে মুলত স্বাধীনতার পর আর্থিক স্বাচ্ছলতার উদ্দেশ্যেই মহিলা শিল্পীগণ এই পেশা বা শিল্পে নিযুক্ত হন। দেলের গান মূলত শিবাসন পূজা কেন্দ্রিক। পূজার সময় শিবাসনের প্রতিমা নারীর মাথায় স্থাপন করা হয়। এই নারীকে বলা হয় দেল-বালা বা দেল-নাচুনি। দেল-নাচুনি কেবল গায়িকা নন; তিনিই পূজার প্রধান। তাঁর মাথায় প্রতিমা বসে, তাঁর শরীরে আসন স্থাপন হয়। ফলে দেবতা ও সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেন তিনিই। এই এক বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী নারীকে আমরা দেখতে পাই কেবল দেলের গানেই।

নারীরা এই গানের মাধ্যমে শুধু ভক্তি প্রকাশ করেন না; তাঁরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাও মিশিয়ে দেন। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের গান গাওয়ার সময় তাঁরা গ্রামীণ বউঝিদের অভিমান, হাসি, দুঃখ এবং ভালোবাসার গল্প ঢুকিয়ে দেন। দেবকাহিনি তাই হয়ে ওঠে মানবিক, আর গান হয়ে ওঠে নারীর কন্ঠে বলা সমাজকথা।

প্রবীণ দেল-বালা দেবলা বালা দাস তাঁর অভিজ্ঞতা শোনাতে গিয়ে বলেন—'আগে আসন বসিয়ে গান গাইলে গ্রামে সম্মান, খাওয়াদাওয়া, নতুন কাপড়—সবকিছুই পাওয়া যেত। এখন আর সেই দিন নেই। মানুষ আর

Scotopia: বিলুপ্তির পথে নারীকন্ঠের লোকসুর
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

ডাকে না, গান শোনার আগ্রহ নেই।' তাঁর কথায় মিশে আছে একদিকে গর্ব, অন্যদিকে তীব্র অভিমান। এই অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, নারীরা কেবল দেলের গান পরিবেশক নন; তাঁরা এটিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে টিকিয়ে রাখার মূল শক্তি। কিন্তু বর্তমান সময়ে তাঁদের অবহেলা ও দারিদ্র্যের কারণে গানটি বিলীন হওয়ার মুখে। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, দেলের গান নারীর আত্মপ্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সারাবছর তাঁরা গৃহস্থালি ও কৃষিশ্রমে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু দেলের গানের মাধ্যমে তাঁরা প্রকাশ করেন কন্ঠ, শরীর ও আবেগ। এখানে নারী কেবল গৃহস্থালি জীবনের সীমায় আবদ্ধ নন; তিনি শিল্পী, পুরোহিতা ও সমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি।

দেলের গান শুধু ধর্মীয় পূজার অংশ ছিল না; এটি ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতারও একটি মাধ্যম। পূজার সময় দেল-বালারা পেতেন চাল, ডাল, কাপড়, নগদ অর্থ। এগুলো দিয়েই তাঁদের সংসার কিছুটা চলত। কিন্তু এখন পূজার সংখ্যা কমেছে, মানুষ আর আগের মতো দানও করে না। ফলে এই গান আর জীবিকার উৎস হিসেবে টেকসই নয়। অন্যদিকে সামাজিক মর্যাদার অভাবও একটি বড় সমস্যা। যদিও পূজার সময়ে দেলনাচনী দের সম্মান দেওয়া হতো, কিন্তু বছরের অন্য সময়ে তাঁরা থেকে যেতেন সাধারণ গৃহবধূ বা কৃষিশ্রমিক। তাঁদের শিল্পীসত্তার কোনো স্বীকৃতি মিলত না। ফলে তাঁদের জীবনে থেকে যেত দ্বৈততা—একদিকে পূজার শিল্পী, অন্যদিকে অবহেলিত নারী। দেল-বালারা মূলত কৃষক পরিবার থেকে আসেন। বছরের অধিকাংশ সময় তারা— ক্ষেতের কাজ করেন, গৃহস্থালির দায়িত্ব সামলান, সংসারের খরচ জোগাতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন। কিন্তু পূজার সময়ে তারা হয়ে ওঠেন সম্মানিত শিল্পী। গ্রামের মানুষ তাঁদের আহ্বান করেন, পূজার অর্ঘ্য দেন, খাওয়ান, নতুন কাপড় উপহার দেন। তবে এই সম্মান অনেক সময় ঋতুকেন্দ্রিক। চৈত্র মাস শেষ হলেই তাঁদের শিল্পী পরিচয় চাপা পড়ে যায়। ফলে দেল-বালারা দ্বৈত পরিচয়ের অধিকারী। একদিকে তাঁরা সাধারণ গৃহবধূ বা শ্রমজীবী নারী, অন্যদিকে তাঁরা গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক।

দেলের গানকে কেউ কেউ বলেন, নারীকন্ঠে পরিবেশিত লোকনাট্য। এতে সঙ্গীত, নৃত্য, সংলাপ ও আচার একসঙ্গে মিশে আছে। শিবায়ন কাব্যের প্রভাব থাকলেও দেলের গান নিজস্ব আঙ্গিকে স্বতন্ত্র। এর ভাষা আঞ্চলিক, এর সুর সহজ, এর নাট্যরূপ গ্রামীণ। ফলে দেলের গান লোকসাহিত্যের এক দুর্লভ নিদর্শন, যেখানে ভক্তি, প্রেম, হাস্যরস ও সামাজিক ব্যঙ্গ মিলেমিশে আছে। বর্তমান সময়ে দেলের গান প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। প্রধান কারণ হলো— আধুনিক বিনোদনের প্রভাব, শহরমুখী সংস্কৃতি, পূজার সংখ্যা হ্রাস, দেলের বালাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট, সামাজিক স্বীকৃতির অভাব এবং প্রজন্মান্তরে অনীহা। গানটি মৌখিকভাবে প্রচলিত থাকায় লিখিত বা অডিও-ভিজ্যুয়াল সংরক্ষণ হয়নি, ফলে এর অনেকটাই হারিয়ে গেছে।

দেলের গানকে বাঁচাতে হলে দরকার সুসংহত উদ্যোগ। প্রথমত, সব গান, মন্ত্র ও আখ্যান লিখিত আকারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং করতে হবে। বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে দেল-বালাদের জন্য অনুদান ও আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এছাড়া জেলা ও রাজ্য স্তরে দেলের গান উৎসব আয়োজন করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রকল্প চালু হলে একদিকে এই গান সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হবে।

দেলের গান কেবল একটি লোকগান নয়; এটি বাংলার গ্রামীণ নারীর ভক্তি, প্রেম, দাম্পত্য অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক সত্তার এক অমূল্য দলিল। নারীর কন্ঠ ছাড়া দেলের গান কল্পনা করা যায় না। নারীরাই একে বাঁচিয়ে

Scotopia: বিলুপ্তির পথে নারীকন্ঠের লোকসুর
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

রেখেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের অবহেলা ও সামাজিক পরিবর্তনের কারণে এই গান বিলীন হওয়ার পথে।

দেলের গানকে রক্ষা করা মানে কেবল একটি লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ নয়, বরং বাংলার নারীর কণ্ঠে বেঁচে থাকা ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া। এখনই যদি উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে দেলের গান কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। তাই আজ জরুরি এই গানকে নতুনভাবে সমাজের সামনে আনা, নারীকণ্ঠের এই লোকঐতিহ্যকে বাঁচানো। তবে, বর্তমানে এই সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি এক গভীর সংকটের মুখোমুখি, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে নারীকণ্ঠের লোকসুরের ওপর। আধুনিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং দ্রুত নগরায়ণের ফলে দেলের গানের প্রতি সমাজের আগ্রহ কমে গেছে। এর ফলে: আধুনিক মানুষের অনাগ্রহের কারণে দেলের শিল্পীরা, বিশেষত নারী শিল্পীরা, তাদের গান ও নাচ উপস্থাপনের সুযোগ হারাচ্ছেন। দর্শক-শ্রোতার অভাবে এই শিল্পকর্মের কদর কমে যাচ্ছে, যা নারীদের এই ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে সরে আসতে বাধ্য করছে। পারুল বালাদের মতো শিল্পীরা একসময় যে নাচ-গান করতেন, তারা এখন "ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল" বলে তারা আক্ষেপ করেন। দেলের নারী শিল্পীরা প্রায়শই গৃহ পরিচারিকা বা অন্যান্য প্রান্তিক পেশার সাথে যুক্ত। দেলের গান থেকে প্রাপ্ত আয় তাদের জীবিকার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু পূজার সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং উপার্জনের পথ সংকুচিত হওয়ায় তারা চরম আর্থিক সংকটে ভুগছেন। এই অনিশ্চয়তার কারণে নতুন প্রজন্ম, বিশেষত নারীরা, এই ঐতিহ্যবাহী পেশায় আসতে অনাগ্রহী। ফলে এই গানের পরম্পরা ভেঙে যাচ্ছে। দেলের গানগুলি মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের অংশ। এগুলি লিখিত আকারে বা অন্য কোনো মাধ্যমে সংরক্ষিত না থাকায়, নারী শিল্পীরা তাদের গানের সুর ও কথা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করতে পারছেন না। এটি নতুন প্রজন্মের নারী শিল্পীদের অভাব তৈরি করছে এবং নারী কণ্ঠের লোকসুরের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হচ্ছে। অনেক সময় এই শিল্পকর্মকে সমাজে "ছোট কাজ" হিসেবে দেখা হয়। এই ধরনের সামাজিক অবজ্ঞা শিল্পীদের, বিশেষ করে নারী শিল্পীদের, মনোবল ভেঙে দেয় এবং তাদের এই পেশা থেকে সরে আসার অন্যতম কারণ হয়। পারুল বালা যেমন বলেছেন যে, "অনেকেই এটা ছোট করে দেখেছে", যা এই শিল্প থেকে সরে আসার একটি কারণ।

'শিবাসন' বা 'দেলের গান'-এর বিলুপ্তি শুধু একটি লোকশিল্পের সমাপ্তি নয়, বরং এটি একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নারীর কণ্ঠের এক বিশেষ সুরের নীরব হয়ে যাওয়া। নারী শিল্পীরা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও সংরক্ষণের অভাবে তাদের কণ্ঠের লোকসুর ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যদি এই শিল্পকলাকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে নারী কণ্ঠের এই ঐতিহ্যবাহী দেলের গান কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, যা আমাদের লোকসংস্কৃতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

সাক্ষাৎকার
দেলের নাচ শিল্পী দেবলা বালা দাস

প্রশ্ন : আপনার নাম কি?
উত্তর: আমার নাম দেবলা বালা দাস।

Scotopia: বিলুপ্তির পথে নারীকন্ঠের লোকসুর
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

প্রশ্ন: আপনার বাড়ি কথায়? এপার বাংলার মানুষ আপনি?

উত্তর: আমি বাংলাদেশ যশোরে থাকতাম। ওই দেশের থেকে কবে এসেছি তা মনে নেই। তবে তখন বিয়ে হয়ে ছেলেমেয়েও হয়ে গেছিল। আমরা তো জাতিতে মুচি সম্প্রদায়। তাই সমাজ থেকে পিছিয়ে ছিলাম।

প্রশ্ন আপনার বাবা পেশায় কি কাজ করতেন?

উত্তর: ওই দেশে থাকতে বাবা জন কাটার কাজ করত। আমি পড়াশোনা শিখতে পারিনি, ছেলেদেরও শেখাতে পারেনি। ওই সময় বাংলাদেশে পড়াশোনার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। যেটুকু ছিল সেটুকুও শেখাতে পারেনি। ওই দেশ থেকে চলে এসেছি তাও প্রায় অনেক বছর হল। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ভয়ে চলে এসেছিলাম। এখানে এসে আমরা প্রথমে বাগদা-হেলেঞ্চার দিকে থাকতাম। এছাড়া আমি দেলের গানও করতাম।

প্রশ্নঃ দেলের গানের সঙ্গে যুক্ত হলেন কিভাবে?

উত্তর: আমার মামা আছে বাংলাদেশে। সেই মামা দেল গাইয়ে বেড়াত এদিক ওদিক। সেখানথেকে আমি প্রথম দেল গাওয়া শুরু করি। আমাকে শিখিয়েছিল মামা।

প্রশ্ন: এখন গান শোনাতে পারবেন? অন্তত কবিতার মত করে বললেও হবে।

উত্তর: এখন সেইসব গান অত মনে নেই। আগার থেকে করলে গোড়া ভুলে যাই। আর গোড়া মনে থাকলে আগা ভুলে যাই।

প্রশ্ন: দেলের গান শিখেছেন কখনও?

উত্তর: না, টাকা-পয়সা ছিল না। আর শেখার সুযোগও পাইনি তেমন।

প্রশ্ন : আপনি পেশায় কি কাজ করতেন? এখন তো অনেক বয়স হয়েছে তাই জানতে চাইছিলাম।

উত্তর: হ্যাঁ, এখন আমার বয়স সত্তর প্রায়। ওই দেশে তো খুবই কষ্ট করেছি। এই দেশে স্বামীর ঘরে যা কষ্টে আমি কাটিয়েছি এমন কষ্ট কেউ করবে না। আমার স্বামী ধামা-ঝুড়ি বুনতে পারত। সেই ধামা-কুড়ি গ্রামে গ্রামে বিক্রি করত। তার বদলে বেশির ভাগই চাল গম পেত। মাঝে মাঝে টাকা পেত। ছেলেরাও অনেক ছোট থেকে কাজ করছে।

প্রশ্ন: দেলের নাচ করে উপার্জন হয়নি কিছু?

উত্তর: খুবই সামান্য। যদিও আগে চৈত্র মাস আসলেই এদিক-ওদিক বায়না থাকত দেলের। অপেক্ষায় থাকতাম। এখন তো দেলের গান হয় না। আগে বাড়ি বাড়ি আসত দেল নাচাতে। দেলের ভাত খাওয়াতাম।

প্রশ্ন: সে সময়ের আনন্দ উদ্দিপনা তো তাহলে ভালই ছিল। কেমন নিয়ম ছিল বলবেন?

উত্তর: নিয়ম আর কি ছিল! দেলের খবর আসলে প্রতি বাড়ি বাড়ি খাওয়ানো হত। যে যেমন পারত খাওয়াত। দেলের দলে ভাগ হয়। দশজন দলে থাকলে সবাইকে তো একা খাওয়ানো সম্ভব নয়, তাই ভাগ হত। আমারও এরকম বহু দেলের নাচ করতাম। পুরো পরিবার নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতাম। খাবারের আভাব থাকত না ওই সময়। নতুন বছরের পোশাক জোগাড় হয়ে যেত কপাল ভাল থাকলে।

Scotopia: বিলুপ্তির পথে নারীকন্ঠের লোকসুর
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

প্রশ্নঃ এখন আর নাচ গান করেন না আপনি। দেলের নাচও আর দেখা যায় না। এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: আসলে আনেকেই এটা ছোট করে দেখেছে। একসময় এই নাচ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল আর করতাম না আমরা। বিয়ের পরও করেছি অনেক। নিয়ম মানতাম। এখন তো ভক্তি শ্রদ্ধা উথে গেছে মানুষের।

প্রশ্ন আপনার পরিবারের আর কেউ এই গানের সঙ্গে যুক্ত আছে?

উত্তর: আমার ছেলেমেয়েরা এসবের সঙ্গে যুক্ত নেই। জন খাটার কাজ করে। বউমারা বিড়ি বাঁধে। এভাবেই কোনওমতে সংসার চলে। আমি চাই না পরিবারের কেউ করুক। সম্মান নেই একদম।

আকর গ্রন্থ

১) দেলের গানের পাণ্ডুলিপি
২) দেলের পুজোর মন্ত্রের পাণ্ডুলিপি

সহায়ক গ্রন্থ

১) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
২) অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা
৩) ড. নির্মল দাস, চর্যাগীতি পরিক্রমা, প্রকাশক: দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৪) ড. সুতপা মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য নারী সমাজ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা
৫) সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা
৬) তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা
৭) ডঃ দেবেশ আচার্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আদি ও মধ্যযুগ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা